হোম কামিং

আহমেদ সাবের

-১-

আমি ক্লাসের শেষে হাসপাতালে এসেছি জর্জকে দেখতে। ও হ্যাঁ, জর্জ হচ্ছে মার্গারেটের স্বামী। আর মার্গারেট? না, মার্গারেট আমার কেউ না, তবে পরিচিত বলা যেতে পারে। লোকে বলে, এক সঙ্গে দু পা হাটলেই নাকি বন্ধুত্ব হয় – সে হিসেবে মার্গারেট আমার বন্ধুই বটে। আমরা একই বাসের সহযাত্রী মাস দুয়েক ধরে। মেরীল্যান্ডে একই বাস ষ্টপ থেকে আমরা বাস ধরি। আমি ডাক্তার হলেও, এ দেশে নতুন এসেছি নার্সিং এর ছাত্র হিসেবে। তবে মূল কোর্স শুরু করার আগে আমাকে ইংরেজীর একটা কোর্স, যাকে এখানে আই,ই,এল,টি,এস বলে, তা করতে হবে। মেরীল্যান্ডে আমরা ক জন বন্ধু মিলে একটা বাসা ভাড়া করেছি। আমার ক্লাস টা যেহেতু সাপ্তাহে দু দিন বিকেলে, আমি দুপুর পর্য্যন্ত এখানে সেখানে কাজ করে বাসায় চলে আসি। তারপর বিকেলের বাস ধরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনীর ওয়েষ্টমিড ক্যাম্পাসে চলে যাই ক্লাস করতে।

এক দিন বাসা থেকে বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেছে। দৌড়ে বাস ষ্টপে এসে দেখি একটা বাস সবে মাত্র ছেড়ে গেল। মনটা খারাপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, বাসটা বুঝি মিস হলো; আর সাথে সাথে মিস হলো ক্লাসটাও । এখানকার বাস নিয়ে এই এক জ্বালা, টাইম টেবিল আছে নাম কা ওয়াস্তে। বেশীর ভাগ সময় আসবে দেরী করে। মাঝে মাঝে কি মনে করে চলে যায় সময় হবার আগেই। দেখলাম, বাস ষ্টপের সীটের উপর দুটো শপিং ব্যাগ পাশে রেখে এক বয়স্ক মহিলা বসে বসে উলের কিছু বুনছেন।

যে বাসটা গেল, ওটা কি দুই শ সতের? অনেক দ্বিধা করে প্রশ্নটা করে বসলাম তাকে। ঐ বাস ধরেই আমার ওয়েষ্ট মিডে যাবার কথা।

না। বস; এখনি বাসটা আসবে। বুড়ী নিটিং এর কাঁটায় চোখ রেখে উত্তর করলেন। আমিও ওয়েষ্টমিডে যাব।

একটু পরেই বাস আসলো। আমার সাথে তিনিও উঠলেন একই বাসে । আর, নামলেনও একই সাথে, ওয়েষ্টমিডে। দেখলাম, হাসপাতালের পথ ধরে হেটে যাচ্ছেন তিনি। আমি উলটো দিকের পথ ধরলাম, আমার ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে।

পরের সাপ্তাহে একটু আগেই চলে এসেছি বাস ষ্টপে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমি বসে বসে বাসের আসার পথের দিকে তাকাচ্ছি বার বার, একটু পর পর। এমন সময় চোখে পড়লো, এক হাতে ছাতা, আর আরেক হাতে দুটো শপিং ব্যাগ হাতে হন্ত দন্ত হয়ে আসছেন তিনি। দেখতে না দেখতেই, কিসে পিছল খেয়ে আমার চোখের সামনেই মহিলা চিৎপটাং। ছাতাটা বাতাসের সাথে যাচ্ছিল উড়ে। আমি দৌড়ে গিয়ে ছাতাটা ধরলাম।

বুড়ী ব্যাগ দুটো গুছিয়ে নিয়ে কোন মতে উঠে দাঁড়ালেন।

আর ইউ অল রাইট? কোথাও কি লেগেছে? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলাম।

না, লাগেনি। বলে, ভদ্র মহিলা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বাস ষ্টপের সীটে এসে বসলেন।

আমি কাঁধে আমার ব্যাগ ঝুলিয়ে এক হাতে আমার ছাতা আর অন্য হাতে বুড়ীর ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কি বাজে আবহাওয়া। স্বগোতক্তির মত শোনাল মহিলার কণ্ঠস্বর। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বেঞ্চের খালি যায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।

বাস এখনি এসে যাবে। আমি তার ছাতাটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললাম।

তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয় নি। তুমি না থাকলে ছাতাটা খোয়াত আজকে।

না না, সে আর কি। বাসটা এত দেরী করছে কেন? আপন মনে বললাম আমি।

আসবে, আসবে। আমাকে শান্তনার বানী শোনালেন তিনি। আমি তো বাসটা প্রতিদিন ধরি; তাই ওর মেজাজ মর্জীর হাল হকিকত ঠিকই জানা আমার। তুমি কি ইন্ডিয়ান? প্রশ্নটা আমাকে।

না; তবে আমাদের তিন দিক ঘিরেই ইন্ডিয়া।

আমাকে বলবেনা কিন্তু। আমি মনে হয় তোমাদের দেশের নামটা জানি .....। বুড়ী একটু সময় নিলেন ভাবতে। তার পর চোখে মুখে খুশী ছড়িয়ে বলে উঠলেন, তোমার দেশের নাম বাংলাদেশ। ঠিক না? প্রশ্নটা আমাকে।

ঠিকই বলেছেন। আমি বললাম। ক্লাসের চিন্তায় আমি বুড়ীর কথায় মনযোগ দিতে পারছিলাম না। বাসটা যে কেন এত দেরী করছে? আবার স্বগোতক্তি করলাম আমি।

এত দেরী তো করার কথা না। উনি আমার কথার উত্তর করলেন। মনে হয় বাসটা আজ আর আসবেনা। কি যে হয়েছে আজ কাল। বাসগুলোও মাঝে মাঝে ফাঁকি দেয়া শুরু করেছে। জর্জ আজ নির্ঘাত রাগ করবে। বেচারা, সারাটা দিন আমার আশায় বসে থাকে। গেলেই বলে, ম্যাগী, এত দেরী করলে কেন? ভাল কথা, আমার নাম মার্গারেট।

আমার নাম ইমন। জর্জ কে? আমি প্রশ্ন করলাম।

কে আবার? আমার স্বামী; এক্সিডেন্ট করে পড়ে আছে হাসপাতালে ছ' মাস ধরে।আক্কেল দেখো হাসপাতালের। ভাল হয়ে গেছে;, তবু লোকটাকে ছাড়তে চায় না। একা একা আমার কত কষ্ট।

তোমার সাথে পরিচয় হয়ে ভাল লাগলো। চলি, বলে পা বাড়ালাম আমি।

পরের বাসটা তো একটু পরেই আসবে। যাবে না? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন মার্গারেট।

সে তো এখনো চল্লিশ মিনিট বাকী। আমি বললাম। আর গিয়ে কি লাভ? তখন গিয়ে ক্লাসটা তো পাবো না।

-২-

আমি যে দিন বাসা থেকে ক্লাসে যাই, সে দিন মার্গারেটের সাথে দেখা হয়। টুক টাক আলাপ থেকে তার পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে গেছি। আমার ভুল ধারনা ছিল যে, তিনি বৃটিশ। আসলে তিনি এসেছেন স্পেন থেকে। স্পেনে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে মার্গারেটের বেশ ভাল ধারনা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উনিশ শ পঞ্চাশ সালে মার্গারেটের বাবা মা অষ্ট্রেলিয়া চলে আসেন; তখন মার্গারেটের বয়স ছিল দশ বছর। বিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় জর্জের সাথে।

জর্জ অষ্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনীতে কাজ করতেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। যুদ্ধের প্রতি বিরাগ জমেছিল তার। তাদের দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সবার বিয়ে হয়ে গেছে। সাপ্তাহের শেষে, যারা পারে তারা দেখা করে যায়।

অন্য দিনের মত বাস ধরতে এসে দেখলাম, মার্গারেট আগ থেকেই এসে বসে আছেন।

কি ব্যাপার, গত সাপ্তাহে তোমাকে দেখিনি যে? আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

গত সাপ্তাহে ক্লাস ছিলো না। বসতে বসতে বললাম আমি। কি ব্যাপার, তোমার উলের কাঁটা যে হাতে নেই? প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম আমি।

জর্জের মাফলারটা গত কাল বুনে শেষ করেছি। মার্গারেট উত্তর করলেন।

তাই বুঝি তোমাকে আজ খুব খুশী দেখাচ্ছে? আবার প্রশ্ন করি আমি।

না, সে জন্য না। আমাদের বিয়ের সুবর্ন জয়ন্তী আগামী শুক্রবার। ছেলে মেয়েরা সবাই আসবে। হাসপাতাল বলেছে, জর্জকেও সে দিন আসতে দেবে।

খুব খুশী হলাম শুনে। জর্জ কে দেখার আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

আজকেই আস না, ক্লাসের পর।

না, আজ পারবো না। ক্লাসের পর আমাকে এক যায়গায় যেতে হবে। শুক্রবার আমার ক্লাস নাই; তবে সেদিন আমি তোমার সাথে হাসপাতালে যাব, জর্জের সাথে দেখা করতে।

ওর বেডের নাম্বারটা রাখ। যদি এর মধ্যে সময় পাও।

আমি আমার ক্লাসের নোট বুক আর কলমটা এগিয়ে ধরলাম। মার্গারেট খস খস করে লিখতে লিখতে বললেন, আমি ওর হোম কামিং এর বিরাট আয়োজন করেছি। কত দিন পর বাড়ী আসবে সে।

বলতে বলতে বাস এসে গেল। সেদিন আর কথা হলো না।

শুক্রবার বিকেলে আমার কাজে যাবার কথা ছিল; সেটা বাতিল করলাম। সামান্য সঞ্চয় থেকে কিছু পয়সা খরচ করে ছোট দেখে একটা ফুলের তোড়া কিনলাম। একটু আগে ভাগেই আসলাম বাস ষ্টপে। দেখলাম, মার্গারেট তখনো আসেননি। ঘর বাড়ী গোছাতে দেরী হচ্ছে বোধহয়, ভাবলাম আমি। মার্গারেটের পরিবারের কথা মনে হলো। ছেলে মেয়ে কেউ নেই পাশে। একা একা সব করতে হয় তাকে। এই বয়সে আমাদের দেশের মহিলারা নাতি নাতনী পরিবেষ্টিত থাকে। আমাদের দেশে আর কত দিন থাকবে সেই পরিবার প্রথা? সেখানেও পরিবার গুলোও বদলে যাচ্ছে যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে। আমি চলে এসেছি বাবা মা, ভাই বোনদের ছেড়ে। কবে ফিরবো ঠিক নেই।

ঘড়ি দেখছি, বাসের আসার পথ দেখছি, মার্গারেটের আসার পথ দেখছি। একটু পর বাস আসলো। অভ্যাস মাফিক বাসের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে সাথে সাথে বসে পড়লাম। বাসটার গতি একটু স্লথ হলো, কিন্তু থামলো না।

আমি আরো কিছুক্ষন বসে থেকে বাসায় ফিরে আসলাম। বাসায় আসার পরও মার্গারেটের ভাবনাটা মাথা থেকে সরাতে পারছি না। সে কি আগেই চলে গেছে হাসপাতালে? হাসপাতালে গিয়ে কি দেখে

আসব একবার? গিয়ে কি লাভ? জর্জ হয়তো বাসায় চলে গেছে। জর্জকে তো শুধু আজকের জন্য ছেড়ে দেবার কথা। আগামী সাপ্তাহে মার্গারেটে ঠিকই আবার হাসপাতালে যাবে; তখন ওর সাথে গেলেই চলবে। আর তা ছাড়া আমার কাছে জর্জের বেড নাম্বার তো আছেই। যখন ইচ্ছা গেলেই হবে।

-৩-

পরের দু সাপ্তাহ মার্গারেটের আর দেখা নেই। জর্জকে হয়তো হাসপাতাল থেকে পুরোপুরিই ছেড়ে দিয়েছে। তাই মার্গারেটকে আর হাসপাতালে যেতে হচ্ছে না। কেমন হলো জর্জের হোম কামিং? ছেলে মেয়েরা কি সবাই আসতে পেরেছিল? আবোল তাবোল ভাবতে থাকি আমি।

কথায় কথায় আমার ফ্যাট-মেট রোকন ভাইকে বললাম মার্গারেট আর জর্জের কথা। রোকন ভাই বছর খানেকের উপর এ দেশে আছেন। আমার কথা শুনে অবাক হলেন তিনি।

কি বললে? ভদ্রলোক ছয় মাস ধরে হাসপাতালে আছেন? ভাল হয়ে যাবার পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওনাকে ছাড়ছেনা? কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। হাসপাতালে বেডের দারুন সমস্যা এখানে। যেখানে রুগীকেই ধরে বেধে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেখানে ভাল মানুষকে ছ মাস ধরে হাসপাতালে রেখে দিয়েছে, কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মার্গারেট শুধু শুধু মিথ্যা বলতে যাবেন কেন? আমি আমতা আমতা করে বলি।

সেটা তোমার মার্গারেটই জানে। বললেন রোকন ভাই।

মনে মনে আমি কিছুটা চটে যাই রোকন ভাই এর উপর। মার্গারেট কি মিথ্যা বলেছেন আমার কাছে? আমার কাছে গাল গল্প ফেঁদে লাভ কি তার? মার্গারেট প্রসঙ্গ সেদিনের মত সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

পর দিন ক্লাসের শেষে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। জর্জ হয়তো বাসায় চলে গেছে। যায় যাক, তবুওতো ওর খবরটা অন্ততঃ জানা যাবে। ভাগ্য ভাল হলে দেখাও হয়ে যেতে পারে।

বিদেশী ডাক্তারদের এখানে ডাক্তারী করার আগে একটা পরীক্ষা পাশ করতে হয়। সে পরীক্ষার প্রিপারেশানের জন্য অনেক বিদেশী ডাক্তার ওয়েষ্ট মিড হাসপাতালের লাইব্রেরীতে এক সাথে পড়া শুনা করে। আমার এক বন্ধুও লেখা পড়া করতে লাইব্রেরীতে আসে। ওর সাথে আমিও আগে দু বার ওয়েষ্ট মিড হাসপাতালে এসেছি। সুতরাং রাস্তা ঘাট মোটামুটি চেনা। আজ হাসপাতালে ঢুকে লাইব্রেরীর পথে পা না বাড়িয়ে সোজাসুজি জর্জের ওয়ার্ডে চলে এলাম। দরজার উপর নাম্বার ধরে একেবারেই চলে গেলাম জর্জের বেডে।

না জর্জ নেই; ওর বিছানায় শুয়ে আছে একটা বিশ বাইশ বছরের ছোকরা; ডান পা পুরো প্লাষ্টারে মুড়ে। মাথার কাছে বসে আছে প্রায় একই বয়সী এক যুবতী। দু জনে গল্পে ব্যাস্ত।

তুমি কি কাউকে খুজছ? আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি থেকে বললো মেয়েটা।

হ্যাঁ, জর্জ নামের কেউ। এই বেডেই থাকার কথা।

না, সে নামে এখানে কেউ নেই। বললো মেয়েটা। তবে আমরা আসার আগে থাকতে পারে। ডেভিড এখানে আছে তিন দিন ধরে। ছেলেটাকে দেখিয়ে বললো সে। তুমি নার্স দের জিজ্ঞেস কর। ওরা বলতে পারে।

আমি মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সতের নাম্বার বেডে জর্জ নামে যে রোগী ছিল, ওর কি ডিসচার্জ হয়ে গেছে। নার্সিং ষ্টেশানে বসে থাকা একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

জর্জ? অবাক হল নার্সটা। এ নামে তো সতের নাম্বার বেডে কোন রুগী ছিল বলে আমার জানা নেই। তুমি কি ঠিক ওয়ার্ডে এসেছ? বলে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন নার্সটা।

আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষন। তারপর ব্যাগ থেকে নোট বইটা বের করলাম। মার্গারেট এর লেখাটা দেখলাম আবার। না ওয়ার্ড ঠিকই আছে; বেড নাম্বারও ভুল হয় নি।

তারপর খাতার দিকে তাকিয়ে স্বগোতক্তির মত বললাম, মার্গারেট তো তাই লিখে দিয়েছেন।

তুমি কি মার্গারেটের স্বামী জর্জকে খুজতে এসেছ? পাশ থেকে বললেন আরেক জন নার্স।

একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলাম আমি। মুখে বললাম, হ্যাঁ।

তুমি মার্গারেটকে চেন কি করে?

বাস ষ্টপে দেখা হয়েছিল। বললেন, স্বামীকে দেখতে প্রতিদিন আসেন হাসপাতালে।

তুমি কি জর্জের ব্যাপারে কিছুই জান না?

না। আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম আমি।

প্রায় মাস ছয়েক আগে মারা গেছে জর্জ। একটা গাড়ী এক্সিডেন্টের পর এসেছিল আমাদের ওয়ার্ডে। মারা গেছে সতের নাম্বার বেডে। জর্জ মারা গেছে বিশ্বাস হয়নি মার্গারেটের; আসত প্রতিদিন বিকেলে। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে চলে যেত। কিন্তু গত দু সাপ্তাহ ধরে সেও আর আসছে না।

-৪-

আমি এখন বাসে; ফিরে যাচ্ছি বাসায়। সারা বাসে আমরা তিন জন যাত্রী। মনটা ঘুরে ফিরে চলে যাচ্ছে জর্জের কাছে, মার্গারেটের কাছে। মার্গারেটে কি অসুস্থ্য? তিনি কি বেঁচে আছেন? না হলে গত দু সাপ্তাহ তার দেখা নেই কেন? মার্গারেটের বদলে জর্জই কি আয়োজন করেছেন হোম কামিং এর, সেই অচেনা জগতে, তাদের বিয়ের সুবর্ন জয়ন্তীতে ।

মার্গারেটে যেতেই জর্জ হয়তো বলে উঠেছেন, এত দেরী করলে কেন ম্যাগী?

সিডনী, ১০-১৪ নভেম্বর, ২০১০